কবির ভণিতা

কবির ভণিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি গ্রন্থের 'সূচনা'-রূপে যে-সকল মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছিলেন, বিভিন্ন খণ্ডে (১-৫, ৭। আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৮) মুদ্রিত সেই রচনাগুলি পাঠকের ব্যবহারসৌকর্যার্থ এই গ্রন্থে একত্র সংকলিত হইল।

প্রভাতসংগীত সম্বন্ধে মন্তব্য রচনা -কালে রবীন্দ্রনাথ 'কবির ভণিতা' শিরোনামটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থের শিরোনাম তাহা হইতে গৃহীত।

সূচী

কাব্য

সন্ধ্যাসংগীত ১১
প্রভাতসংগীত ১৩
ছবি ও গান ১৬
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৮
কড়ি ও কোমল ২১
মানসী ২৪
সোনার তরী ২৭
চিত্রা ৩১
চৈতালি ৩৫
কথা ॥ কাহিনী ৩৭

নাট্য

বাল্মীকি-প্রতিভা ॥ মায়ার খেলা ৪১
প্রকৃতির প্রতিশোধ ৪৩
রাজা ও রানী ৪৫
চিত্রাঙ্গদা ৪৭
মালিনী ৪৯

উপন্যাস

বউ-ঠাকুরানীর হাট ৫৫
রাজর্ষি ৫৮
চোখের বালি ৬০
নৌকাডুবি ৬৩

কাব্য

সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থাবলীতে আমার কাব্যরচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। তার পূর্বেও অনেক লেখা লিখেছি কিন্তু সেগুলিকে লুপ্ত করবার চেষ্টা করেছি অনাদরে। হাতের অক্ষর পাকাবার যে খাতা ছিল বাল্যকালে সেগুলিকে যেমন অনাদরে রাখি নি, এও তেমনি। সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুক, বাইরে থেকে মডেল লেখা নকল করবার সাধনায়। কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্‌শ করে আমরা অক্ষর ছেঁদে থাকি বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধ্যেও নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেই রকম কপিবুকের কবিতা।

সেই কপিবুক যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরে নি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার

কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।

প্রভাতসংগীত

কড়ি ও কোমল রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয় নি। কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল; এইজন্যে ওগুলো হয়েছে ঢেউওয়ালা জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মতো আঁকা-বাঁকা; ওরা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে নি, সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারে নি। সেইজন্যে আমার মত এই যে, কড়ি ও কোমলের পর থেকেই আমার কাব্যরচনা ভালো মন্দ সব-কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।

প্রভাতসংগীতে যে অবস্থায় আমার প্রথম বিকাশোন্মুখ মন অপরিণত ভাবনা নিয়ে অপরিস্ফুট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তার কথা আজো আমার মনে আছে। তার পূর্বে সন্ধ্যা-সংগীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদ্‌গদ-ভাষী আন্দোলন চলছিল। প্রভাতসংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা-আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে, ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা-চাষের জমিতে। সেই সময়কার কথা মনে পড়ছে যখন কোথা

থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দরমহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ঐগুলোর নাম, অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি। অনন্ত জীবন বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসেছিল, বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর-অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা। এই ভাবনাটা ভিতরে ভিতরে মনকে খুব দোলা দিয়েছিল। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে একটা ধারণা আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল যে আমার প্রতিমুহূর্তের সমস্ত ভালোমন্দ, আমার প্রতিদিনের সুখদুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো অনবরত একটা সৃষ্টিরূপ ধরছে, প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে যে সৃষ্টির স্বরূপ। এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই মনে হল মৃত্যু তা হলে কী? একরকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে, জীবন সব-কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব-কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে, গাঁথা পড়ছে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। মুহূর্ত-কালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে মর্ত্যজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবাল দ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার

"কড়ি ও কোমল" রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয় নি। কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ নিতে চাচ্ছে কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীর দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল; এই জন্যে ওগুলো হয়েছে ঢেউখেলানো জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মতো আঁকাবাঁকা; ওরা মূর্ত হয়ে ওঠেনি, সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারেনি। সেই জন্যে আমার মত এই, "কড়ি ও কোমলের পর থেকেই আমার কাব্যরচনা ভালো মন্দ সব কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির চেহারা অবলম্বন করেছে।

প্রভাত সঙ্গীতে যে অবস্থায় আমার প্রথম বিকাশোন্মুখ মন অপরিচিত ভাবনা নিয়ে অপরিস্ফুট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তার কথা আজো আমার মনে আছে। তার পূর্বে সন্ধ্যাসঙ্গীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের অস্পষ্ট ভাষী আন্দোলন চলছিল। প্রভাতসঙ্গীতের মধ্যে আপনা আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা আকৃতির মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় ফলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা চাষের জমিতে।

'কবির ভণিতা', প্রভাতসংগীত । পাণ্ডুলিপিচিত্র

জাল বিস্তার করে চলবে— আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক-এক ফোঁড়ে এক-এক লোককে সম্বন্ধসূত্রে গাঁথবে। মনে আছে এই চিন্তায় আমার মনকে খুব আনন্দ দিয়েছিল। প্রতিধ্বনি কবিতা লিখেছিলুম যখন প্রথম গিয়েছিলুম দার্জিলিঙে। যে ভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে, বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে রূপ হয়ে ধ্বনি হয়ে। এই ভাবগুলো যদিও অস্পষ্ট তবু আমার মনের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল, মুখে মুখে কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাও করেছি। কিন্তু এ-সকল ভাবনা তখন কী গদ্যে কী পদ্যে আলোচনা করবার সময় হয় নি, তখনো পাই নি ভাষাভারতীর প্রসাদ। তাই বলে রাখছি প্রভাতসংগীতে এ সমস্ত লেখার আর কোনো মূল্য যদি থাকে, সে ষোলো আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়।

১৬।৭।৩৯
শ্রীনিকেতন

ছবি ও গান

ছবি ও গান নিয়ে আমার বলবার কথাটা বলে নিই। এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলছে। ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট। সে যেন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয় নি তো।

কবি সংসারের ভিতরে তখনো প্রবেশ করে নি, তখনো সে বাতায়নবাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়। এর কোনো-কোনোটা চোখে দেখা এক টুকরো ছবি পেনসিলে আঁকা, রবারে ঘষে দেওয়া, আর কোনো-কোনোটা সম্পূর্ণ বানানো। মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্যে চলতি ভাষা

আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল। ছবি ও গান কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময়নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেকটা সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন-প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক তখন আমি চোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেস্ক্ থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না।

পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হত আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা

আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি। যদি ফিরে পেতুম তা হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামত মানে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত।

তার পরের সোপানে ওঠা গেল পদাবলীর জালিয়াতিতে। অক্ষয়বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল করবার লোভ হয়েছিল। এ কথা মনেই ছিল না যে ঠিকমত নকল করতে হলেও শুধু ভাষায় নয় ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথুনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয় তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণব-চিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের

পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। এ'কে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।

প্রথম গানটি লিখেছিলুম একটা স্লেটের উপরে, অন্তঃপুরের কোণের ঘরে—

গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে।

মনে বিশ্বাস হল চ্যাটার্টনের চেয়ে পিছিয়ে থাকব না।

এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।

১১।৭।৪০
শান্তিনিকেতন

কড়ি ও কোমল

যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্‌বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষায় আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলায় তোলা এক মুঠো বেল ফুল, পায়ে এক জোড়া চটি। মনে আছে থ্যাকারের দোকানে বই কিনতে গেছি কিন্তু এর বেশি পরিচ্ছন্নতা নেই, এতে ইংরেজ দোকানদারের স্বীকৃত আদবকায়দার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ হত। এই আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা কড়ি ও কোমলের কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই রীতির কবিতা তখনো প্রচলিত ছিল না। সেইজন্যেই কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সাহিত্য-বিচারকদের কাছ থেকে কটুভাষায় ভর্ৎসনা সহ্য করেছিলুম। সে-সব যে উপেক্ষা করেছি অনায়াসে সে কেবল যৌবনের তেজে। আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে

আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক। তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্য-রীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলে ছিলুম। আমাদের পরিবারের বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্যে ভালোলাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারে নি। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের কোনো মিশ্রণ যদি ঘটে থাকে তো সে গৌণভাবে।

এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বরাবর প্রবাহিত হয়েছে—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,—

যা নৈবেদ্যে আর-এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর-একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্‌ভব।

৭।১২।৩৯

শান্তিনিকেতন

মানসী

বাল্যকাল থেকে পশ্চিম-ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এদেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। বহু শতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থানপতন এবং নব নব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে। অনেক দিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম-ভারতের কোনো-এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শ লাভ করব মনের মধ্যে। অবশেষে এক সময়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এত দেশ থাকতে কেন যে গাজিপুর বেছে নিয়েছিলুম তার দুটো কারণ আছে। শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত। আমি যেন মনের মধ্যে গোলাপ-বিলাসী সিরাজের ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। সেখানে গিয়ে দেখলুম ব্যাবসাদারের গোলাপের খেত, এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই; হারিয়ে গেল সেই ছবি। অপর পক্ষে, গাজিপুরে মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর কোথাও বড়ো রেখায় ছাপ দেয় নি। আমার চোখে এর চেহারা ঠেকল সাদা-

কাপড়-পরা বিধবার মতো, সেও কোনো বড়োঘরের ঘরণী নয়।

তবু গাজিপুরেই রয়ে গেলুম তার একটা কারণ এখানে ছিলেন আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়, আফিম-বিভাগের একজন বড়ো কর্মচারী। এখানে আমার সমস্ত ব্যবস্থা সহজ হল তাঁরই সাহায্যে। একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইল খানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের খেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিমগাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার চালওয়ালা পল্লী।

গাজিপুর আগ্রা-দিল্লির সমকক্ষ নয়, সিরাজ-সমরখন্দের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না, তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা

বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল। আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বারবার দেখেছি। এইজন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম আমার লেখনী হঠাৎ নতুন পথ নিল শিশুর কবিতায়, অথচ সে-জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো উপলক্ষই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনা-ধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্যরূপের প্রকাশ। মানসীও সেই রকম। নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী কড়ি ও কোমল -এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।

সোনার তরী

জীবনের বিশেষ পর্বে কোনো বিশেষ প্রকৃতির কাব্য কোন্ উত্তেজনায় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয় এ প্রশ্ন কবিকে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিপন্ন করা হয়। কী করে সে জানবে। প্রাণের প্রবৃদ্ধিতে যে-সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার ভিতরকার রহস্য সহজে ধরা পড়ে না। গাছের সব ডাল একই দিকে একই রকম করে ছড়ায় না, এদিকে ওদিকে তারা বেঁকেচুরে পাশ ফেরে, তার বৈজ্ঞানিক কারণ লুকিয়ে আছে আকাশে বাতাসে আলোকে মাটিতে। গাছ যদি বা চিন্তা করতে পারত তবু সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এই মন্ত্রণা-সভায় সে জায়গা পেত না, তার ভোট থাকত না, সে কেবল স্বীকার করে নেয়, এই তার স্বভাবসংগত কাজ। বাইরে বসে আছে যে প্রাণবিজ্ঞানী সে বরঞ্চ অনেক খবর দিতে পারে।

কিন্তু বাইরের লোক যদি তাদের পাওনার মূল্য নিয়েই সন্তুষ্ট না থাকে, যদি জিজ্ঞাসা করে মালগুলো কেমন করে কোন্ ছাঁচে তৈরি হল, তা হলে কবির মধ্যে যে আত্মসন্ধানের হেড আপিস আছে সেখানে একবার তাগাদা করে দেখতে হয়। বস্তুত সোনার তরী তার নানা পণ্য নিয়ে কোন্ রপ্তানির ঘাট থেকে আমদানির ঘাটে এসে পৌঁছল ইতিপূর্বে কখনো

এ প্রশ্ন নিজেকে করি নি, কেননা এর উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্যের অঙ্গ নয়। মূলধন যার হাতে সেই মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কথা কয় না, আমি তো মাঝি, হাতের কাছে যা জোটে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসে পৌঁছিয়ে দিই।

মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা-ঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম এর পূর্বে তা আর কখনো করি নি। নূতনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে, তারি এসেছিল ডাক, মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়ে ছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু সোনার তরীর লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করে ছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন

এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্র-সাধনের ক্ষেত্রে।

আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য-সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম

কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে কিন্তু আমাকে নেবে কি ?

চিত্রা

ভক্ত যখন বলেন, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি, তখন হৃষীকেশের থেকে ভক্ত নিজেকে পৃথক করে দেখেন সুতরাং তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একা হৃষীকেশের 'পরেই। চিত্রা কাব্যে আমি এক-দিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে দুঃখে আমার ভালোয় মন্দয়। এই সংকল্প-সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে, যন্ত্রেরও স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ, পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি। এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা। সেইজন্যেই বলা হয়েছে—

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার

রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে।

পরমদেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর-এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ। সংসারে এই দুই সত্তার বিরোধ সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভাবে বহন করছে তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই ; নিজের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে নি এই ভ্রষ্টতা মানুষের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয়। আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কি না এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্রা কবিতায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত চিত্রায় জীবন-রঙ্গভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়। মানুষের আত্মিক সৃষ্টি কেন ? প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া গেছে। আঙ্গারিক যুগের শ্রীহীন গাছগুলো কেন টিকতে পারল না। আজ পরবর্তী গাছগুলিতে সমস্ত পৃথিবীকে দিয়েছে শোভা। কোন্ শিল্পী রচনার সূত্রপাতে প্রথম ব্যর্থ হয়েছিল, মাথা নেড়েছিল, হাতের কাজ নিষ্ঠুর ভাবে মুছতে মুছতে সংস্কার সাধন করেছে এ-কথা যখন ভাবি তখন সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন

বিভাগে দুই সত্তার মিলন-চেষ্টা স্পষ্ট দেখতে পাই। সেই চেষ্টা কী নিষ্ঠুর ভাবে নিজেকে জয়যুক্ত করতে চায়, মানুষের ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া যায়, আজ তার সেই আত্মঘাতী প্রমাণ যেমন প্রকট হয়েছে এমন আর কখনো হয় নি। চিত্রার প্রথম কবিতায় তার একটি সূচনায় বলা হয়েছে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

তার পর আছে—

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

আজ ব্যাখ্যা করে যে-কথা বলবার চেষ্টায় আছি সেই কথাটাই এই কবিতার মধ্যে ফুটতে চেয়েছিল। বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কর্মজীবনের সেই বিচিত্রের ডাক পড়েছে। 'আবেদন' কবিতায় ঠিক তার উল্‌টো কথা। কবি বলেছে, "কর্মক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে, সেখানে আমার স্থান নয়। আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে।" জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথা। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী

কবির কাছে এ দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য। 'ব্রাহ্মণ' 'পুরাতন ভৃত্য' 'দুই বিঘা জমি' এইগুলির কাব্যকাকলি নীড়ের, বাসার ; 'স্বর্গ হইতে বিদায়' এখানে সুর নেমেছে ঊর্ধ্বলোক থেকে মর্ত্যের পথে ; 'প্রেমের অভিষেক'-এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম, তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্‌কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম ; 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় বাঙালি ঘরকন্নার যে আভাস আছে তার প্রতিও লোকেন কটাক্ষ বর্ষণ করেছিল, ভাগ্যক্রমে তাতে বিচলিত হই নি, হয়তো দু-চারটে লাইন বাদ পড়েছে। লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্র-ভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন। আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পদ্য ও গদ্য রচনাকে চালনা করেছি—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

চৈতালি

নদীর প্রবাহের একধারে সামান্য একটা ভাঙা ডাল আটকা পড়েছিল। সেইটেতে ঘোলা জল থেকে পলি ছেঁকে নিতে লাগল। সেইখানে ক্রমে একটা দ্বীপ জমিয়ে তুললে। ভেসে-আসা নানা কিছু অবান্তর জিনিস দল বাঁধল সেখানে, শৈবাল ঘন হয়ে সেখানে ঠেকল এসে, মাছ পেল আশ্রয়, এক পায়ে বক রইল দাঁড়িয়ে শিকারের লোভে, খানিকটুকু সীমানা নিয়ে একটা অভাবিত দৃশ্য জেগে উঠল— তার সঙ্গে চার দিকের বিশেষ মিল নেই। চৈতালি তেমনি একটুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে-রূপ নিয়ে, অল্প কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্যে তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।

পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়াল-ঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসল-কাটা শস্যখেত ধূ ধূ করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকাল এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে

ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষ-বোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে 'এটাই যথেষ্ট' তখন তার উপরে রঙ লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এইজন্যেই।

এর প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক।

আমার অল্প বয়সের লেখাগুলিকে একদিন ছবি ও গান এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেম। তখন আমার মনে ছিল আমার কবিতার সহজ প্রবৃত্তিই ওই দুটি শাখায় নিজেকে প্রকাশ করা। বাইরে আমার চোখে ছবি পড়ে অন্তরে আমি গান গাই। চৈতালিতে অনেক কবিতা দেখতে পাই যাতে গানের বেদনা আছে কিন্তু গানের রূপ নেই। কেননা, তখন যে-আঙ্গিকে আমার লেখনীকে পেয়ে বসেছিল তাতে গানের রস যদি বা নামে, গানের সুর জায়গা পায় না।

২০ জুলাই ১৯৪০

শান্তিনিকেতন

কথা ॥ কাহিনী

তার পরে একদিন এল যখন আর-একটা ধারা বন্যার মতো মনের মধ্যে নামল। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজি অলংকারশাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ। অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইল না। আমার কাব্যভূগোলে আর-একটা দ্বীপ তৈরি হয়ে উঠল। মনের সেই অবস্থায় কখনো কখনো কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্যরূপ নিল। প্রথম তার লক্ষণ দেখতে পাই পতিতায়। ক্রমে ক্রমে দেখা দিল কচ ও দেবযানী, ধৃতরাষ্ট্র-যুধিষ্ঠির সংবাদ, কর্ণকুন্তী, নরকবাস, সতী। সকলের শেষে চিত্রাঙ্গদা।

এ-সব লেখার ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক, চিন্তার বিষয় এর মনস্তত্ত্ব। রচনার প্রবৃত্তি অনেক থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে, হঠাৎ কোনো একটা প্রান্তে উদ্‌বোধিত হলে যারা ছিল অজ্ঞাতবাসে তারা যথোচিত সূত্রে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথা ও কাহিনীর কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক-একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।

ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট

রেখায়। সেইজন্তে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে স্বভাবত বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে। সেই সময়ে এই বহির্দৃষ্টির প্রেরণা কাব্যে ও নাট্যে ভিড় করে এসেছিল ইতিহাসের সঞ্চয় নিয়ে। এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়। সেই সময়ে আমি ভ্রমণে ছিলুম, অপরিচিত নদী ও খালের ভিতর দিয়ে চলেছিলুম উড়িষ্যায়।

২০ জুলাই ১৯৪০
শান্তিনিকেতন

নাট্য

বাল্মীকি-প্রতিভা ॥ মায়ার খেলা

বাল্মীকি-প্রতিভায় একটি নাট্য-কথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর মহলে পা দিয়েছি; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল-বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠছিল। বাল্মীকি-প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল। কবির মনের মধ্যে বাজছিল মানুষের জয়গান। মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারে নি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী। মায়াকুমারীদের কাছ থেকে এই

ভর্ৎসনা কানে এল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,

শুধু সুখ চলে যায়,

এমনি মায়ার ছলনা।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে, বদ্ধ ঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসংগীত এবং প্রভাতসংগীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।

তার পরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে। তখনো বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি আবেগের বাষ্পপুঞ্জ থেকে। তবু দুঃস্বপ্নের মতো আপনার বাঁধন-জাল ছাড়াবার জন্যে জেগে উঠল বালকের আগ্রহ। এই সময়কার রচনা ছবি ও গান।. লেখনীর সেই নূতন বহির্মুখী প্রবৃত্তি তখন কেবল ভাবুকতার অস্পষ্টতার মধ্যে বন্ধন স্বীকার করলে না। বেদনার ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথে সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল বাল্মীকি-প্রতিভায়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না। কিছুকাল পরে, তখন আমার বয়স বোধ হয়

তেইশ কিংবা চব্বিশ হবে, কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয় সে কল্পনায় রূপায়িত। 'হেদে গো নন্দরানী' গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরানীর কাছে এসেছে আবদার করতে, তারা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা.অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।

২৮।১।৪০

শান্তিনিকেতন

রাজা ও রানী

একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক— রাজা ও রানী। এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাজমি। ওই লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

এরা   সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,

শুধু   সুখ চলে যায়

এমনি   মায়ার ছলনা ॥

২৮।১।৪০

শান্তিনিকেতন

চিত্রাঙ্গদা

অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে— তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেইসঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্‌কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর

পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেইসঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।

২৫।২।৪০

উদয়ন

মালিনী

মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত। কবিকঙ্কণকে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন তাঁর গুণকীর্তন করতে। আমার স্বপ্নে দেবীর আবির্ভাব ছিল না, ছিল হঠাৎ মনের একটা গভীর আত্মপ্রকাশ ঘুমন্ত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে।

তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। প্রবাসী বাঙালিদের প্রায়ই সেখানে হত জটলা, আর তার সঙ্গে চলত ভোজ। গোলেমালে রাত হয়ে গেল। যাঁদের বাড়িতে ছিলুম অত রাত্রে দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে হঠাৎ চমক লাগিয়ে দিলে গৃহস্থ সেটাকে দুঃসহ বলেই গণ্য করতেন তাই পালিত সাহেবের অনুরোধে তাঁর ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিলুম। বিছানায় যখন শুলুম তখনো চলছে কলরবের অন্তিম পর্ব, আমার ঘুম ছিল আবিল হয়ে।

এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার

সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।

জেগে উঠে যেটা আমাকে আশ্চর্য ঠেকল সেটা হচ্ছে এই যে, আমার মনের একভাগ নিশ্চেষ্ট শ্রোতামাত্র অন্য ভাগ বুনে চলেছে একখানা নাটক। স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক একটা কথাবার্তার ধারা গল্পকে বহন করে চলেছিল। জেগে উঠে সে আমি মনে আনতে পারলুম না। পালিত সাহেবকে মনের ক্রিয়ার এই বিস্ময়করতা জানিয়েছিলুম। তিনি এটাতে বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য বোধ করলেন না।

কিন্তু অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।

বোধ করি এই নাটিকায় আমার রচনার একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল, সেটা অনুভব করেছিলুম যখন দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে বাসকালে এর ইংরেজি অনুবাদ কোনো ইংরেজ বন্ধুর চোখে পড়ল। প্রথম দেখা গেল এটা আর্টিস্ট রোটেনস্টাইনের মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। কখনো কখনো এটাকে তাঁর ঘরে অভিনয় করবার ইচ্ছেও তাঁর হয়েছিল। আমার মনে হল এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁর শিল্পী-মনে মূর্তিরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার পরে একদিন ট্রেভেলিয়ানের

মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনলুম। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন। তার অর্থ কী তা আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি কারণ যদিও কিছু কিছু তর্জমা পড়েছি তবু গ্রীক নাট্য আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। শেক্‌সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে। মালিনীর নাট্যরূপ সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন। এর বাহিরের রূপায়ণ সম্বন্ধে যে মত শুনেছিলুম এ হচ্ছে তাই। কবিতার মর্মকথাটি প্রথম থেকেই যদি রচনার মধ্যে জেনেশুনে বপন করা না হয়ে থাকে তবে কবির কাছেও সেটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে দেরি লাগে, আজ আমি জানি মালিনীর মধ্যে কী কথাটি লিখতে লিখতে উদ্‌ভাবিত হয়ে ছিল গৌণরূপে ঈষৎ-গোচর। আসল কথা, মনের একটা সত্যকার বিস্ময়ের আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে।

আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে

নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।

আমার এ-মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়। বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনাআপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সে-কথা ভেবে দেখবার যোগ্য। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়।

উপন্যাস

বউ-ঠাকুরানীর হাট

অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।

প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারি প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউ-ঠাকুরানীর হাট গল্পে—একটা রোম্যান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্প বয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চারিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। আজো হয়তো এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়ে নি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেয়াল যা তা কাণ্ড করত বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু

কারিগরি বেরিয়ে পড়ে।

সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসা-পত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে— এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।

এই উপলক্ষে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলা-দেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর

ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস-লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।

২৯।১।৪০

উদয়ন

রাজর্ষি

রাজর্ষি সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ পেয়েছি। বলবার বিশেষ কিছু নেই। এর প্রধান বক্তব্য এই যে এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস।

বালক পত্রের সম্পাদিকা আমাকে ওই মাসিকের পাতে নিয়মিত পরিবেশনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফল হল এই যে প্রায় একমাত্র আমিই হলুম তার ভোজের জোগানদার। একটু সময় পেলেই মনটা কী লিখি কী লিখি করতে থাকে।

রাজনারায়ণবাবু ছিলেন দেওঘরে। তাঁকে দেখতে যাব বলে বেরনো গেল। রাত্রে গাড়ির আলোটা বিশ্রামের ব্যাঘাত করবে বলে তার নিচেকার আবরণটা টেনে দিলুম। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সহযাত্রীর মন তাতে প্রসন্ন হল না, ঢাকা খুলে দিলেন। জাগা অনিবার্য ভেবে একটা গল্পের প্লট মনে আনতে চেষ্টা করলুম।

ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখলুম একটা পাথরের মন্দির। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয় কী বেদনা। বাপকে সে বার বার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন। বাপ কোনো-

মতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম গল্প পাওয়া গেল। এই স্বপ্নের বিবরণ জীবনস্মৃতিতে পূর্বেই লিখেছি, পুনরুক্তি করতে হল।

আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিকপত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল।

বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। ফসল-খেতের যেখানে কিনারা সেদিকটাতে চাষ পড়ে নি, আগাছায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। সাময়িক পত্রের অবিবেচনায় প্রায়ই লেখনীর জাত নষ্ট হয়। বিশেষ যেখানে শিশু পাঠকই লক্ষ্য সেখানে বাজে বাচালতার সংকোচ থাকে না। অল্প বয়সের ছেলেদেরও সম্মান রাখার দরকার আছে এ কথা শিশুসাহিত্য-লেখকেরা প্রায় ভোলেন। সাহিত্য রচনায় গুণী লেখনীর সতর্কতা যদি না থাকে যদি সে রচনা বিনা লজ্জায় অকিঞ্চিৎ-কর হয়ে ওঠে তবে সেটা অস্বাস্থ্যকর হবেই বিশেষতঃ ছেলেদের পাকযন্ত্রের পক্ষে। দুধের বদলে পিঠুলি গোলা যদি ব্যবসার খাতিরে চালাতেই হয় তবে সে ফাঁকি বরঞ্চ চালানো যেতে পারে বয়স্কদের পাত্রে তাতে তাঁদের রুচির পরীক্ষা হবে কিন্তু ছেলেদের ভোগে নৈব নৈব চ।

চোখের বালি

আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে চোখের বালি উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয় সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দুরূহ। সব চেয়ে সহজ জবাব হচ্ছে ধারাবাহিক লম্বা গল্পের উপর মাসিকপত্রের চিরকেলে দাবি নিয়ে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় বের করলেন শ্রীশচন্দ্র। আমার নাম যোজনা করা হল তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ-অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারি নি, এবারেও তাই হল।

আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নব পর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেদিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে। সহ-সম্পাদক শৈলেশের বিশ্বাস ছিল আমি এই

মাসিকের বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দিতে পারি। অতএব কোমর বাঁধতে হবে আমাকে। এ যেন মাসিকের দেওয়ানি আইন -অনুসারে সম্পাদকের কাছ থেকে উপযুক্ত খোরপোশের দাবি করা।

বস্তুত ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোটো গল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা-ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনো হত এখনো হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জার অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব-বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায় নি। তার পরে ঐ পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোটো গল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রূঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায় নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি এরা নির্মম সাহিত্যের

পর্যায়েই পড়বে। তার পরে পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলেছে। বঙ্গ-দর্শনের নবপর্যায় একদিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-এক দিকে এনেছিল গল্পে এমন-কি কাব্যেও মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তার পরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল। চোখের বালির গল্পকে ভিতর দিকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

নৌকাডুবি

পাঠক যে-ভার নিলে সংগত হয় লেখকের প্রতি সে-ভার দেওয়া চলে না। নিজের রচনা উপলক্ষে আত্মবিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এইজন্যে, যে, নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এ-কাজ করা অসম্ভব— এইজন্য নিষ্কাম বিচারের লাইন ঠিক থাকে না। প্রকাশক জানতে চেয়েছেন নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এ-সব কথা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে সে হল প্রকাশকের তাগিদ। উৎসটা গভীর ভিতরে, গোমুখী তো উৎস নয়। প্রকাশকের ফরমাসকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তা ছাড়া বলব কী? গল্পটায় পেয়ে বসা আর প্রকাশকে পেয়ে বসা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। বলা বাহুল্য ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না। গল্পলেখার পেয়াদা যখন দরজা ছাড়ে না তখন দায়ে পড়ে ভাবতে হল কী লিখি। সময়ের দাবি বদলে গেছে। একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল— অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু ঔৎসুক্য-জনক। এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর

সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়, কোনো একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে। বন্ধনটা এবং সংস্কারটা দুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তা হলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত সুতীব্র, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্র্যাজিক শোচনীয়তার ক্ষতচিহ্ন। ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান বাহন হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ— তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনো-ভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয় যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে। এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না। কেবল বলব গল্পের মধ্যে যে অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে সেটাতে যদি রসের অপচয় না ঘটে থাকে তা হলে সমস্ত নৌকাডুবি থেকে সেই অংশে হয়তো কবির খ্যাতি কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু এও অসংকোচে বলতে পারি নে কেননা রুচির দ্রুত পরিবর্তন চলেছে।

—

পাঠপরিচয়

কবির ভণিতা গ্রন্থে অনেক স্থলে মূল পাণ্ডুলিপির পাঠ লওয়া হইয়াছে। তাহার বিবরণ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

মানসীর ভূমিকার পাণ্ডুলিপিতে মুদ্রিত অংশের পরে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ছিল, প্রেসকপিতে এই অংশের পাশে রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে মন্তব্য আছে—'বাদ দিতে হবে / —রবীন্দ্রনাথ'
বর্জিত অংশটি মুদ্রিত হইল :

"এই একই কথা খাটে সোনার তরীর কবিতা সম্বন্ধে। সেই সোনার তরীর যুগে অধিকাংশ সময়েই আমি কলকাতার বন্ধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছি। অর্থাৎ আমি তখন ছিলুম দূরবিহারী। আমার ছন্দ তাই আনন্দিত, নানা রং লেগেছে আমার ভাবের বিকাশে। বাংলা দেশের নানা নদীর পথ বেয়ে বেয়ে আমি তখন ফিরেছি বাংলা পল্লীর অঙ্গনে অঙ্গনে। এর পর থেকে আর আমি সহরের ইট কাঠের খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিনি। চলেছে আমার কবিত্বের পালা খোলা আকাশের নিচে। তার পরে আমার অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ঘটেছে দেশে বিদেশে, জীবনের পরিণতি শাখা বিস্তার করেছে নানা দিকে। এ সমস্তই পাঠকদের আলোচনার বিষয়। এ নিয়ে নিজে আমি আর অধিক কিছু বলতে চাই নে।"

সোনার তরীর ভূমিকায় এই অংশ ভাষান্তরে সংযোজিত আছে।

পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী 'কথা'র ভূমিকাটি 'কথা ও কাহিনী'[১]র ভূমিকা।

[১] কাহিনী অর্থে স্বতন্ত্র কাহিনী গ্রন্থ বুঝিতে হইবে।

পরে 'কথা'র ভূমিকারূপে সংশোধিত। ভূমিকাটি চৈতালির ভূমিকার অনুবৃত্তে রচিত। সেই কারণে পাণ্ডুলিপিতে আরম্ভ 'তার পরে একদিন এল…'। রচনাবলীতে ব্যবহারের সময় চৈতালি ও কথা বিভিন্ন খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় 'তার পরে' শব্দ বর্জিত হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পুনঃসংযোজিত হইল।

প্রথম অনুচ্ছেদের শেষের দুইটি বাক্য (প্রথম তার লক্ষণ…শেষে চিত্রাঙ্গদা।) পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। এই অংশ রচনাবলীতে বর্জিত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পঞ্চম ছত্রে পাণ্ডুলিপিতে 'কথা'র স্থলে 'কথা ও কাহিনী'র আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির পাঠ গৃহীত হইয়াছে। রচনাবলীতে 'কথা'র ভূমিকাস্বরূপ ব্যবহার করায় পরিবর্তিত হয়।

'কথা'র ভূমিকার শেষ বাক্যটি ('সেই সময়ে আমি…উড়িষ্যায়') রচনাবলীতে বর্জিত। বর্তমান ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।

'বাল্মীকি-প্রতিভা ॥ মায়ার খেলা' ভূমিকাটি রচনাবলীতে বাল্মীকি-প্রতিভার ভূমিকারূপে ব্যবহৃত। পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম 'বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলা'।

প্রথম অনুচ্ছেদের সপ্তম ছত্রে রচনাবলীর পাঠ 'উঠেছিল'। বর্তমান ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির অনুসরণে সংশোধিত।

রাজা ও রানীর ভূমিকার পাণ্ডুলিপিতে প্রথম অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ—

"তার পরে যে নাটক দেখা দিয়েছে সে হচ্ছে রাজা ও রানী। এর রচনাতেও আছে দুটো ধারা। এর নাট্য-ভূমিকায় প্লাবন হয়েছে

লিরিকের। সেই লিরিকে রসাবিষ্ট হয়ে এর নাট্য হয়েছে দুর্বল। যেমন করে সৃষ্টি হয় জলাজমির। গীতিকাব্যিক আপনাকে ভুলতে পারে নি, জিনিসটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজিতে যাকে বলে মেলোড্রামা। ইলা এবং কুমারের উপসর্গটা একেবারেই অসংগত। সেটা শোকাবহ নয় শোচনীয়। তরুণ লেখকের মধুর রসাসক্ত মনটা ছিল নিতান্তই কাঁচা। কেবল এই নাটকে যেখানে দেখানো হয়েছে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায় তাকেই আমি ভালো বলি এবং বলি যথার্থ নাট্য পরিণতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুমারের মুণ্ডপাতে এই নাটকের মুণ্ডপাত হয়ে গেছে।"

'রাজর্ষি'র ভূমিকায় পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রথম ছত্রে 'অহিংস্র' স্থলে রচনাবলীর পাঠ 'অহিংস'।

'চোখের বালি'র ভূমিকায় প্রথম অনুচ্ছেদের দশম ছত্রে পাণ্ডুলিপিতে 'মনে' স্থলে 'জীবনে' ছিল।

তৃতীয় অনুচ্ছেদের ত্রয়োদশ ছত্রের পর পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত অংশ ছিল—

"তার প্রধান প্রমাণ এই— ঐ লেখা নিয়ে গাল খেয়েছি প্রচুর পরিমাণে, বাস্তবের পরুষ চিত্র সহ্য করবার মতো অভ্যাস তখনো পাঠকদের হয় নি।"

কয়েকটি ভূমিকার তারিখ ও স্থান পাণ্ডুলিপি হইতে সন্নিবেশিত।

বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকাগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর নিম্নলিখিত খণ্ডে প্রকাশিত। যে-ক্ষেত্রে সংস্করণের উল্লেখ নাই সে-ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণ বুঝিতে হইবে :

সন্ধ্যাসংগীত। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৬
প্রভাতসংগীত। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৬
ছবি ও গান। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। আশ্বিন ১৩৪৬
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৭
কড়ি ও কোমল। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড। পৌষ ১৩৪৬
মানসী। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৭
সোনার তরী। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৭
চিত্রা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৪৭
চৈতালি। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৭
কথা ও কাহিনী। রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড। আষাঢ় ১৩৪৮
বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪৬
প্রকৃতির প্রতিশোধ। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪৬
রাজা ও রানী। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪৬
চিত্রাঙ্গদা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড। ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৭

মালিনী। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৪৭

বউ-ঠাকুরানীর হাট। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪৬

রাজর্ষি। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৭

চোখের বালি। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড। ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৭

নৌকাডুবি। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

মূল্য ২.৫০ টাকা